গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী রচনার পুনর্মুদ্রণের সুযোগ যে কোনও বাঙালি প্রকাশকের কাছে পরম সৌভাগ্যের। সবিনয়ে স্বীকার করি, এই অধিকার একই সঙ্গে প্রকাশকের পক্ষে গুরুতর দায়িত্বও বটে। সুষ্ঠুভাবে তা পালনের জন্য আমরা তিনজনের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছি। এই ত্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মনস্ক বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভবতোষ দত্ত একটি বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তাছাড়া দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক। বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাব্রতী পবিত্র সরকার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য। নিত্যপ্রিয় ঘোষ সমকালের একজন বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিশীল, প্রখর সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার গভীরতা এবং নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকসমাজে তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের আমন্ত্রণে 'পুনশ্চ' -র রবীন্দ্রসাহিত্য সঠিকভাবে বহুল প্রচারের উদ্যোগে সানন্দে সাড়া দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের নিরন্তর সতর্ক, সক্রিয় এবং সদর্থকউপদেশই আমাদের যাত্রাপথে পাথেয়।

প্রতিটি রচনাসংগ্রহেই পাঠকের পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় পরিচিতি লিখেছেন বিশিষ্ট একজন সম্পাদক। কখনও কখনও উপদেষ্টা নিজেই অনুগ্রহ করে পালন করেছেন সম্পাদকের দায়িত্ব। তাঁদের এবং অন্যান্য সম্পাদক, সকলকেই জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠাক্রম অনুসারে

ঘাটের কথা	১৩	একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	১৭৯
রাজপথের কথা	২০	সমাপ্তি	১৮১
দেনাপাওনা	২৩	সমস্যাপূরণ	১৯৬
পোস্টমাস্টার	২৮	খাতা	২০১
গিন্নি	৩৩	অনধিকার প্রবেশ	২০৫
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	৩৫	মেঘ ও রৌদ্র	২০৯
ব্যবধান	৩৯	প্রায়শ্চিত্ত	২২৯
তারাপ্রসন্নের কীর্তি	৪৩	বিচারক	২৩৮
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	৪৮	নিশীথে	২৪৪
সম্পত্তি-সমর্পণ	৫৪	আপদ	২৫৩
দালিয়া	৬০	দিদি	২৬১
কঙ্কাল	৬৭	মানভঞ্জন	২৬৯
মুক্তির উপায়	৭৩	ঠাকুরদা	২৭৭
ত্যাগ	৮০	প্রতিহিংসা	২৮৪
একরাত্রি	৮৫	ক্ষুধিত পাষাণ	২৯৫
একটা আষাঢ়ে গল্প	৯০	অতিথি	৩০৪
জীবিত ও মৃত	৯৭	ইচ্ছাপূরণ	৩১৭
স্বর্ণমৃগ	১০৬	দুরাশা	৩২১
রীতিমত নভেল	১১৫	পুত্রযজ্ঞ	৩৩১
জয়পরাজয়	১১৮	ডিটেকটিভ	৩৩৪
কাবুলিওয়ালা	১২৫	অধ্যাপক	৩৪১
ছুটি	১৩১	রাজটিকা	৩৫৫
সুভা	১৩৭	মণিহারা	৩৬৪
মহামায়া	১৪১	দৃষ্টিদান	৩৭৬
দানপ্রতিদান	১৪৭	সদর ও অন্দর	৩৯২
সম্পাদক	১৫২	উদ্ধার	৩৯৪
মধ্যবর্তিনী	১৫৫	দুর্বুদ্ধি	৩৯৭
অসম্ভব কথা	১৬৫	ফেল	৪০০
শাস্তি	১৭১	শুভদৃষ্টি	৪০৩
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	১৭৯	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	৪০৭

উলুখড়ের বিপদ	৪১১
প্রতিবেশিনী	৪১৩
নষ্টনীড়	৪১৬
দর্পহরণ	৪৫৭
মাল্যদান	৪৬৫
কর্মফল	৪৭৫
গুপ্তধন	৫০৩
মাস্টারমশায়	৫১৬
রাসমণির ছেলে	৫৩৮
পণরক্ষা	৫৬৫
হালদারগোষ্ঠী	৫৮০
হৈমন্তী	৫৯৬
বোষ্টমী	৬০৭
স্ত্রীর পত্র	৬১৬
ভাইফোঁটা	৬২৮
শেষের রাত্রি	৬৪০
অপরিচিতা	৬৫২
তপস্বিনী	৬৬২
পয়লা নম্বর	৬৭১
পাত্র ও পাত্রী	৬৮৩
নামঞ্জুর গল্প	৬৯৫
সংস্কার	৭০৪
বলাই	৭০৮
চিত্রকর	৭১১
চোরাই ধন	৭১৫
রবিবার	৭২১
শেষ কথা	৭৩৭
ল্যাবরেটরি	৭৫৫
বদনাম	৭৮৭
প্রগতিসংহার	৭৯৬
শেষ পুরস্কার	৮০৬
মুসলমানীর গল্প	৮০৮
'শেষ কথা' গল্পের পাঠান্তর	৮১১
ভিখারিণী	৮৩২
করুণা	৮৪৩
মুকুট	৮৯৬
গ্রন্থপরিচয়	৯১৩
বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের প্রকাশকালের তালিকা	৯২৫

সূচিপত্র

বর্ণানুক্রম অনুসারে

অতিথি	৩০৪	তপস্বিনী	৬৬২
অধ্যাপক	৩৪১	তারাপ্রসন্নের কীর্তি	৪৩
অনধিকার প্রবেশ	২০৫	ত্যাগ	৮০
অপরিচিতা	৬২৫	দর্পহরণ	৪৫৭
অসম্ভব কথা	১৬৫	দানপ্রতিদান	১৪৭
আপদ	২৫৩	দালিয়া	৬০
ইচ্ছাপূরণ	৩১৭	দিদি	২৬১
উদ্ধার	৩৯৪	দুরাশা	৩২১
উলুখড়ের বিপদ	৪১১	দুর্বুদ্ধি	৩৯৭
একটা আষাঢ়ে গল্প	৯০	দৃষ্টিদান	৩৭৬
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	১৭৯	দেনাপাওনা	২৩
একরাত্রি	৮৫	নষ্টনীড়	৪১৬
কঙ্কাল	৬৭	নামঞ্জুর গল্প	৬৯৫
করুণা	৮৪৩	নিশীথে	২৪৪
কর্মফল	৪৭৫	পণরক্ষা	৫৬৫
কাবুলিওয়ালা	১২৫	পয়লা নম্বর	৬৭১
ক্ষুধিত পাষাণ	২৯৫	পাত্র ও পাত্রী	৬৮৩
খাতা	২০১	পুত্রযজ্ঞ	৩৩১
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	৪৮	পোস্টমাস্টার	২৮
গিন্নি	৩৩	প্রগতিসংহার	৭৯৬
গুপ্তধন	৫০৩	প্রতিবেশিনী	৪১৩
ঘাটের কথা	১৩	প্রতিহিংসা	২৮৪
চিত্রকর	৭১১	প্রায়শ্চিত্ত	২২৯
চোরাই ধন	৭১৫	ফেল	৪০০
ছুটি	১৩১	বদনাম	৭৮৭
ছোটোগল্পের প্রকাশকালের তালিকা	৯২৫	বলাই	৭০৮
জয়পরাজয়	১১৮	বিচারক	২৩৮
জীবিত ও মৃত	৯৭	বোষ্টমী	৬০৭
ঠাকুরদা	২৭৭	ব্যবধান	৩৯
ডিটেক্‌টিভ	৩৩৪	ভাইফোঁটা	৬২৮

ভিখারিনী	৮৩২	ল্যাবরেটরি	৭৫৫
মণিহারা	৩৬৪	শাস্তি	১৭১
মধ্যবর্তিনী	১৫৫	শুভদৃষ্টি	৪০৩
মহামায়া	১৪১	শেষ কথা	৭৩৭
মানভঞ্জন	২৬৯	শেষ পুরস্কার	৮০৬
মাল্যদান	৪৬৫	শেষের রাত্রি	৬৪০
মাস্টারমশায়	৫১৬	সংস্কার	৭০৪
মুকুট	৮৯৬	সদর ও অন্দর	৩৯২
মুক্তির উপায়	৭৩	সমস্যাপূরণ	১৯৬
মুসলমানীর গল্প	৮০৮	সমাপ্তি	১৮১
মেঘ ও রৌদ্র	২০৯	সম্পত্তি-সমর্পণ	৫৪
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	৪০৭	সম্পাদক	১৫২
রবিবার	৭২১	সুভা	১৩৭
রাজটিকা	৩৫৫	স্ত্রীর পত্র	৬১৬
রাজপথের কথা	২০	স্বর্ণমৃগ	১০৬
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	৩৫	হালদারগোষ্ঠী	৫৮০
রাসমণির ছেলে	৫৩৮	হৈমন্তী	৫৯৬
রীতিমত নভেল	১১৫	গ্রন্থপরিচয়	৯১৩

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস ; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারি দিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহা কাঁচা সোনার মতো রঙ, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। রৌদ্রের এমন রঙ আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনো কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয় ; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি— এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার

হৃদয় চিরকাল নবীন। বহু বৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর, চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ঐ-যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন, উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত। আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল ; সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল—বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলাগাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনো গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথগাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনো আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের

দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি ; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি জলে খেলা করিত বা গল্প করিত বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্‌মি। যখন-তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময় বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি— আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত ; দুই-এক দিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা

করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন, সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না, বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল, গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন, তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের সুখদুঃখের-স্মৃতিলেশমাত্র-হীন আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি— তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলাফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেইদিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদগীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত— আহা কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফাটিয়া চারি দিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ

করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরো কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।'

আর-এক জন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওমা, তাই তো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্যেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।'

আর-এক জন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, 'আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।'

আর-এক জন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, 'আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।'

তখন কেহ কহিল, 'তার এত দাড়ি ছিল না।'

কেহ বলিল, 'সে এমন একহারা ছিল না।'

কেহ কহিল, 'সে যেন এতটা লম্বা নয়।'

এইরূপ এ কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না— কুসুমের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মন্দিরে ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিমগাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্বচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-